বিশেষ ক্রোড়পত্র

অঙ্গসজ্জা : চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর (ডিএফপি) ◆ সহযোগিতা : তথ্য অধিদফতর (পিআইডি), তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

বাণী

১৭ মার্চ বাঙালি জাতির ইতিহাসে একটি স্মরণীয় দিন। ১৯২০ সালের এই দিনে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশের মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান গোপালগঞ্জের নিভৃতপল্লি টুঙ্গিপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। জাতির পিতার ১০২তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে আমি মহান এ নেতার স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাচ্ছি।

বঙ্গবন্ধুর ছোটোবেলা কেটেছে গ্রামের কাদা-জল, মেঠো পথ আর প্রকৃতির খোলামেলা পরিবেশে। শৈশব থেকেই তিনি ছিলেন অত্যন্ত মানবদরদি কিন্তু অধিকার আদায়ে আপোশহীন। পরোপকার আর অন্যের দুঃখ-কষ্ট লাঘবে সবসময় তিনি নিজেকে জড়িয়ে নিতেন। জীবনের প্রতিটি ক্ষণে যেখানেই অন্যায়-অবিচার, শোষণ-নির্যাতন দেখেছেন, সেখানেই প্রতিবাদে নেমে পড়েছেন। মাত্র ১৪ বছর বয়সে ব্রিটিশ বিরোধী সভা-সমাবেশে অংশ নেন তিনি। তিনি গরিব ছাত্র-ছাত্রীদের লেখাপড়ার খরচ চালাতে 'মুসলিম সেবা সমিতি' পরিচালনা করেন। চল্লিশের দশকে এই তরুণ ছাত্রনেতা হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক ও মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর সংস্পর্শে এসে সক্রিয় রাজনীতিতে সম্পৃক্ত হন।

'৪৭ এ দেশ বিভাগের কিছুদিন পরই তরুণ নেতা শেখ মুজিব বুঝতে পেরেছিলেন, ব্রিটিশ পরাধীনতার কবল থেকে মুক্তি পেলেও বাঙালি নতুন করে পশ্চিমাদের শোষণের কবলে পড়েছে। শাসকগোষ্ঠী প্রথম আঘাত হানে বাঙালির মায়ের ভাষা 'বাংলা'র উপর। বাংলা ভাষার দাবিতে ধর্মঘট পালনকালে ১৯৪৮ সালের ১১ই মার্চ বঙ্গবন্ধু সচিবালয় গেট থেকে গ্রেফতার হন। এভাবে আন্দোলন-সংগ্রাম ও কারাভোগের মধ্য দিয়েই তিনি বাঙালির অধিকার আদায়ের পথে এগিয়ে চলেন। ১৯৪৮ সালে 'সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ', '৫২ এর ভাষা আন্দোলন, '৫৪ এর যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন, '৫৮ এর সামরিক শাসন বিরোধী আন্দোলন, '৬৬ এর ৬-দফা, '৬৯ এর গণ অভ্যুত্থান, '৭০ এর নির্বাচনসহ বাঙালির মুক্তি ও অধিকার আদায়ে পরিচালিত প্রতিটি গণতান্ত্রিক ও স্বাধিকার আন্দোলনে তিনি নেতৃত্ব দেন। এজন্য তাঁকে বহুবার কারাবরণ করতে হয়েছে। সহ্য করতে হয়েছে অমানুষিক নির্যাতন। কিন্তু বাঙালির অধিকারের প্রশ্নে তিনি কখনো শাসকগোষ্ঠীর সাথে আপোশ করেননি।

বঙ্গবন্ধু ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে বাঙালির আবেগ ও আকাঙ্ক্ষাকে ধারণ করে বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করেন, "এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম", যা ছিল মূলত স্বাধীনতার ডাক। একটি ভাষণ কীভাবে গোটা জাতিকে জাগিয়ে তোলে, স্বাধীনতার জন্য মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে উৎসাহিত করে, বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ তার অনন্য উদাহরণ। এ ভাষণে বঙ্গবন্ধু শুধু স্বাধীনতার ডাকই দেননি বরং মুক্তিযুদ্ধের রূপরেখা ও ভবিষ্যৎ করণীয় সম্পর্কেও দিকনির্দেশনা দিয়ে গেছেন। ২৫ মার্চ রাতে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী অতর্কিতে নিরস্ত্র বাঙালির উপর আক্রমণ চালালে ২৬ মার্চ ১৯৭১ জাতির পিতা ঘোষণা করেন বাঙালি জাতির বহুকাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে দীর্ঘ ন'মাস সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে আমরা অর্জন করি স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ। মুক্তিযুদ্ধকালীন পাকিস্তানের কারাগারে বন্দি অবস্থায় শাসকগোষ্ঠী তাঁকে প্রহসনমূলকভাবে ফাঁসির হুকুম দিয়েছিল। বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, "ফাঁসির মঞ্চে যাওয়ার সময় আমি বলব, আমি বাঙালি, বাংলা আমার দেশ, বাংলা আমার ভাষা"। দেশ ও জনগণের প্রতি তাঁর অসামান্য অবদানের জন্য বাংলা, বাংলাদেশ ও বঙ্গবন্ধু আজ এক ও অভিন্ন সত্তায় পরিণত হয়েছে। স্বাধীনতার পর পাকিস্তান কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে জাতির পিতা ১০ জানুয়ারি স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেন। যুদ্ধবিধ্বস্ত অর্থনীতির পুনর্গঠনে তিনি সর্বশক্তি নিয়োগ করেন। দেশকে 'সোনার বাংলা' হিসেবে গড়ে তোলার সকল প্রস্তুতি তিনি গ্রহণ করেন। কিন্তু স্বাধীনতাবিরোধী ঘাতকচক্র ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট তাঁকে সপরিবারে হত্যার মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর সেই স্বপ্ন পূরণ হতে দেয়নি।

জলে-স্থলে-আকাশে বাংলাদেশের অবস্থান সুদৃঢ় করতে চেয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু। মার্কিন সেক্রেটারি অব স্টেট হেনরি কিসিঞ্জার সদ্যস্বাধীন বাংলাদেশকে তলাবিহীন ঝুড়ির সাথে তুলনা করেন। কিন্তু বঙ্গবন্ধু আমাদের শিখিয়েছেন কীভাবে শত বাধা বিপত্তি পেরিয়ে লক্ষ্যে পৌঁছা যায়। ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণে তিনি বলেছিলেন, "৭ কোটি মানুষকে দাবায়ে রাখতে পারবা না"। আজ থেকে ৫০ বছর আগে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে যে দেশ স্বাধীন হয়েছিল, অনেক চড়াই-উতরাই পার হয়ে সেই বাংলাদেশ এখন উন্নয়নশীল দেশ। আজ সকল আশঙ্কা ও নেতিবাচক ভবিষ্যদ্বাণী ভুল প্রমাণ করে জাতির পিতার অসমাপ্ত স্বপ্ন বাস্তবায়ন করে চলেছেন তাঁর সুযোগ্য উত্তরসূরি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তাঁর বলিষ্ঠ ও দূরদর্শী নেতৃত্বে আজ আমরা দ্রুতগতিতে এগিয়ে যাচ্ছি একটি উন্নত ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার দিকে।

বঙ্গবন্ধু বাঙালি জাতির চিরন্তন প্রেরণার উৎস। রাজনীতিতে তিনি ছিলেন নীতি ও আদর্শের প্রতীক। বাংলাদেশকে জানতে হলে বাঙালির মুক্তি সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে জানতে হবে, বঙ্গবন্ধুকে জানতে হবে। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা আর জাতির পিতার আদর্শকে ধারণ করে জাতি এগিয়ে যাক ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার পথে, নোঙ্গর ফেলুক বঙ্গবন্ধুর 'সোনার বাংলায়'।

জয় বাংলা।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ আবদুল হামিদ

বঙ্গবন্ধুর জন্মদিনের অঙ্গীকার
সকল শিশুর সমান অধিকার

১৭ই মার্চ

জাতীয় শিশু দিবস

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মদিনে

শ্রদ্ধাঞ্জলি

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান- এঁর ১০২তম জন্মবার্ষিকী এবং জাতীয় শিশু দিবস-২০২২ উপলক্ষ্যে দেশের সকল শিশুসহ দেশবাসীকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা। জাতীয় শিশু দিবসে এ বছরের প্রতিপাদ্য 'বঙ্গবন্ধুর জন্মদিনের অঙ্গীকার, সকল শিশুর সমান অধিকার'।

গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়ায় ১৯২০ সালের ১৭ মার্চ প্রখ্যাত শেখ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব। বাল্যকাল থেকেই তিনি ছিলেন নির্ভীক, দয়ালু এবং পরোপকারী। স্কুলে পড়ার সময়েই নেতৃত্বের গুণাবলি ফুটে ওঠে তার মধ্যে। ধীরে ধীরে তিনি হয়ে ওঠেন বাংলার অধিকার আদায়ের শেষ আশ্রয়স্থল। প্রখর স্মৃতিশক্তির অধিকারী ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন এ বিশ্ববরেণ্য নেতার সুদীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনের মূল লক্ষ্য ছিল বাঙালি জাতিকে পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করা। হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ এ বাঙালী বাংলা ভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে নেতৃত্ব দেন। ১৯৪৮ সালে তার প্রস্তাবে বাংলাদেশ ছাত্রলীগ, তমদ্দুন মজলিশ ও অন্যান্য ছাত্র সংগঠনের সমন্বয়ে গঠিত হয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ। ১৯৪৮ সালের ১১ মার্চ বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতির দাবিতে সাধারণ ধর্মঘট পালনকালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে গ্রেফতার করা হয়। ১৯৪৮ থেকে ১৯৫২ পর্যন্ত তিনি বারবার কারারুদ্ধ হন। কখনও জেলে থেকে কখনও বা জেলের বাইরে থেকে তিনি ভাষা আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন। ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারির ছাত্র-জনতার চূড়ান্ত আন্দোলন-বিদ্রোহে কারান্তরীণ অবস্থায় থেকে দিকনির্দেশনা প্রদান করেন। এরই ধারাবাহিকতায় '৫৪-র যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন, '৫৮-র আইয়ুব খানের সামরিক শাসন বিরোধী আন্দোলন, '৬২-র শিক্ষা কমিশন বিরোধী আন্দোলন, '৬৬-র ছয় দফা, '৬৮-এর আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা, '৬৯-এর গণ অভ্যুত্থান, '৭০-এর নির্বাচন এবং '৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের অবিসংবাদিত নেতৃত্বে পরিচালিত হয়।

জাতির পিতার ঐন্দ্রজালিক নেতৃত্ব এবং সম্মোহনী ব্যক্তিত্ব সমগ্র জাতিকে একসূত্রে গ্রথিত করেছিল। যার ফলে আমরা পেয়েছি স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ। বিকাশ ঘটেছে বাঙালি জাতিসত্তার। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শুধু বাঙালি জাতিরই নয়, তিনি ছিলেন বিশ্বের সকল নিপীড়িত-শোষিত-বঞ্চিত মানুষের অধিকার আদায় ও মুক্তির অগ্রনায়ক। তিনি যখন স্বাধীন বাংলাদেশের পুনর্গঠন কাজে আত্মনিয়োগ করেন, তখনই ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট স্বাধীনতার পরাজিত শক্তি তাঁকে পরিবারের বেশিরভাগ সদস্যসহ হত্যা করে। এর মধ্য দিয়ে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক অগ্রযাত্রা ও উন্নয়নকে স্তব্ধ করে দেওয়া হয়। অবৈধ সামরিক সরকারগুলো পরবর্তীতে বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সংবিধানকে ক্ষত-বিক্ষত করে। স্বাধীনতাবিরোধী, যুদ্ধাপরাধী ও প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিকে পুনর্বাসন করে। জনগণ ভাত ও ভোটের অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়। মহান মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসকে বিকৃত করা হয়। ইতিহাসের এই জঘন্যতম হত্যাকাণ্ডের যেন বিচার না হয় সেজন্য প্রণীত হয় দায়মুক্তির কালাকানুন- ইনডেমনিটি অর্ডিনেন্স। দীর্ঘ ২১ বছর পর জনগণের রায়ে ১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করে এই কালাকানুন বাতিল করার মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব হত্যাকাণ্ডের বিচার কার্যক্রম শুরু করে। এ হত্যাকাণ্ডের বিচারের রায় কার্যকরের মধ্য দিয়ে জাতি কলঙ্কমুক্ত হয়।

২০০৯ সাল থেকে ধারাবাহিকভাবে সরকার গঠন করে মানুষের ভাগ্যোন্নয়নের জন্য বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। ইতোমধ্যে আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে বাংলাদেশ অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করেছে। স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা থেকে উন্নয়নশীল দেশের কাতারে উন্নীত হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করেছে। প্রবৃদ্ধি, শিক্ষার হার বেড়েছে। ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে তুলেছি। যুদ্ধাপরাধীদের বিচার চলমান রয়েছে এবং ইতোমধ্যে বেশ কয়েকটি রায় কার্যকর হয়েছে। জাতীয় চার নেতার বিচার কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। জঙ্গিবাদ ও হরতালের অবসান ঘটিয়ে দেশকে স্থিতিশীল রাখতে সক্ষম হয়েছি। গ্রামকে শহরে রূপান্তর করা হচ্ছে। ১০০টি অর্থনৈতিক অঞ্চল, ৩৯টি হাই-টেক পার্ক, বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-২, গভীর সমুদ্রবন্দর, পদ্মাসেতু, এলএনজি টার্মিনাল, এক্সপ্রেসওয়ে, পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রসহ বিভিন্ন মেগা প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। দেশ এগিয়ে যাচ্ছে। আমরা আজ আত্মমর্যাদাশীল দেশ হিসেবে বিশ্বের বুকে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছি। স্বাধীনতাবিরোধী সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠী এবং উন্নয়ন ও গণতন্ত্রবিরোধী শক্তির সকল ষড়যন্ত্র প্রতিহত করে জাতির পিতার অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করতে আমরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

শিশুদের প্রতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের মমতা ছিল অপরিসীম। এজন্য তাঁর জন্মদিনকে শিশুদের জন্য উৎসর্গ করে আওয়ামী লীগ ১৯৯৬ সালে সরকার গঠন করে ১৭ মার্চকে জাতীয় 'শিশু দিবস' হিসেবে ঘোষণা করে। জাতির পিতা বিশ্বাস করতেন, আজকের শিশুরাই আগামী দিনের ভবিষ্যৎ; ভবিষ্যতে দেশ গড়ার নেতৃত্ব দিতে হবে আজকের শিশুদেরই। তাই শিশুরা যেন সৃজনশীল-মুক্তমনের মানুষ হিসেবে গড়ে ওঠে- তিনি সব সময় সেটাই চাইতেন। আমাদের সরকার প্রিয় মাতৃভূমিকে শিশুদের জন্য নিরাপদ আবাসভূমিতে পরিণত করতে অঙ্গীকারাবদ্ধ। শিশুদের কল্যাণের লক্ষ্যে আমরা একটি যুগোপযোগী 'জাতীয় শিশুনীতি ২০১১ ও শিশু আইন-২০১৩' প্রণয়ন করেছি। শিক্ষার্থীদের বছরের শুরুতে বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক প্রদান করা হচ্ছে। প্রায় শতভাগ শিশু আজ স্কুলে যাচ্ছে। আমরা শিশুদের জন্য জাতির পিতার জীবন ও কর্মভিত্তিক বই প্রকাশ এবং পাঠ্য বইয়ে মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত ইতিহাস তুলে ধরেছি। শিশুদের মনে দেশপ্রেম জাগ্রত করে তাদের ব্যক্তিত্ব গঠন, সৃজনশীলতার বিকাশ এবং আত্মবিশ্বাসী করে গড়ে তুলতে দল-মত নির্বিশেষে আমাদের সকলকে একযোগে কাজ করতে হবে। তাদের বাংলাদেশ, মুক্তিযুদ্ধ ও জাতির পিতার সংগ্রামী জীবনের প্রকৃত ইতিহাস জানাতে হবে এবং জ্ঞান সমৃদ্ধ করার পাশাপাশি তাদের দক্ষতা বিকাশের পরিবেশ তৈরি করতে হবে। আসুন, আমরা শিশুদের সুন্দর ভবিষ্যৎ ও কল্যাণে আমাদের বর্তমানকে উৎসর্গ করি এবং সকলে মিলে জাতির পিতার অসাম্প্রদায়িক, ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত ও সুখী-সমৃদ্ধ স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ গড়ে তুলি।

২০২০ সাল ছিল জাতির পিতার জন্মশতবর্ষ। বর্তমান প্রজন্মের শিশুসহ আমাদের সকলের সৌভাগ্য হয়েছে জাতির পিতার জন্মশতবর্ষ উদ্‌যাপনের আয়োজন দেখার। জাতির পিতার জন্মশতবর্ষের আয়োজন আরও আনন্দময় হয়ে উঠেছে আমাদের মহান স্বাধীনতা ও বিজয়ের সুবর্ণজয়ন্তীর বিভায়। জাতীয় শিশু দিবসে জাতির পিতার প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর সঙ্গে সঙ্গে মহান নেতার জীবন ও আদর্শ অনুসরণে এ দেশের শিশুদের যথাযোগ্য সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলাই আমাদের সরকারের মুখ্য লক্ষ্য। এদিনে আমি মহান আল্লাহর কাছে জাতির পিতার বিদেহী আত্মার মাগফিরাত এবং আগামী দিনের কর্ণধার শিশু-কিশোরদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করছি।

আমি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান- এঁর ১০২তম জন্মবার্ষিকী এবং 'জাতীয় শিশু দিবস-২০২২' উপলক্ষ্যে আয়োজিত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা

তুমিই চিনাবে সবে

আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক

আজ ১৭ই মার্চ। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১০৩তম জন্মদিন। বঙ্গবন্ধুর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে ১৭ই মার্চ তারিখটি আমরা জাতীয় শিশু দিবস হিসেবে উদ্‌যাপন করি কারণ জীবদ্দশায় বঙ্গবন্ধু তাঁর জন্মদিনে কিছুটা সময় শিশুদের সাথে কাটাতে পছন্দ করতেন। শিশুরাও বঙ্গবন্ধুর সান্নিধ্যে কিছুটা সময় থাকার জন্য উন্মুখ হয়ে থাকতো।

বঙ্গবন্ধুর জন্মের সাথে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় ইতিহাসের চিরন্তন সত্যে ভাস্বর। বঙ্গবন্ধুকে দিয়েই বিশ্বব্যাপী বাঙালির পরিচয়, বাংলাদেশের পরিচয়। বঙ্গবন্ধু, বাঙালি জাতি, বাংলা ভাষা ও বাংলাদশ একটি অভূতপূর্ব কিন্তু কঠিন সমীকরণ যার পেছনে আছে ত্রিশ লক্ষ মানুষের প্রাণদান।

১৩১৩ বঙ্গাব্দে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত 'তুমিই চিনাবে সবে' পঙক্তিটি এই প্রবল সত্যের অভাবনীয় প্রতিফলন বলেই প্রবন্ধের শিরোনামে উদ্ধৃত হয়েছে বঙ্গবন্ধুর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি হিসেবে।

ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ, ১৯৭১ তারিখে বঙ্গবন্ধু প্রদত্ত ঐন্দ্রজালিক যে ভাষণে বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের কার্যতঃ স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছিলেন "এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম" উচ্চারণ করে (de facto declaration of our independence) সেই ভাষণই ৪৬ বৎসর পর ২০১৭ সালে ইউনেস্কো কর্তৃক বিশ্ব-স্মারক ঐতিহ্য তালিকায় সংযোজিত। মানবসভ্যতা এগিয়ে যাওয়ায় ক্ষেত্রে একটি উজ্জ্বল মাইলফলক হিসেবে বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত। একাত্তরের মহান মুক্তিযুদ্ধে বাঙালিকে দিকনির্দেশনা দিয়েছে যে ভাষণ, এখন সারা পৃথিবীর মানুষের নিকট নিরন্তর অনুপ্রেরণার উৎস সে ভাষণ।

নিজ জন্ম নিয়ে 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' গ্রন্থে বঙ্গবন্ধু লিখেছেন, "আমার জন্ম হয় ফরিদপুর জেলার গোপালগঞ্জ মহকুমার টুঙ্গিপাড়া গ্রামে। আমার ইউনিয়ন হল ফরিদপুর জেলার দক্ষিণ অঞ্চলের সর্বশেষ ইউনিয়ন। এই ইউনিয়নের পার্শ্বেই মধুমতী নদী। মধুমতী খুলনা ও ফরিদপুর জেলাকে ভাগ করে রেখেছে।"

"টুঙ্গিপাড়ার শেখ বংশের নাম কিছুটা এ তদঞ্চলে পরিচিত। শেখ পরিবারকে একটা মধ্যবিত্ত পরিবার বলা যেতে পারে। বাড়ির বৃদ্ধ ও দেশের গণ্যমান্য প্রবীণ লোকদের কাছ থেকে এই বংশের কিছু কিছু ঘটনা জানা যায়। আমার জন্ম হয় এই টুঙ্গিপাড়া শেখ বংশে।" (অসমাপ্ত আত্মজীবনী, পৃঃ১-৩)। জন্মের কথাটি কত সহজভাবে বঙ্গবন্ধু নিজেই লিপিবদ্ধ করে গেছেন।

আজ ২০২২ সালে যখন আমরা বঙ্গবন্ধুর জন্মদিনে জাতীয় শিশু দিবস উদ্‌যাপন করছি তখন স্বাভাবিকভাবেই আমরা ফিরে যাই ৫২ বৎসর পূর্বে একাত্তরের ১৭ই মার্চ তারিখে বঙ্গবন্ধুর ৫২তম জন্মদিনে।

একাত্তরের সেই অগ্নিঝরা মার্চে বঙ্গবন্ধুর জন্মদিনে বহু দেশি-বিদেশি সাংবাদিক সমবেত হয়েছিলেন ধানমন্ডির ৩২ নম্বর সড়কে বঙ্গবন্ধুর বাস ভবনে। ইতিপূর্বেই বৃটিশ গণমাধ্যম বঙ্গবন্ধুর ধানমন্ডিস্থ ৩২ নম্বর সড়কের বাসভবনটিকে লন্ডনের ১০ নম্বর ডাউনিং স্ট্রিটের সাথে তুলনা করে প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে যে সারা পূর্ব পাকিস্তান এখন পরিচালিত হচ্ছে বঙ্গবন্ধুর এই বাড়ি থেকে।

ঐ দিন অর্থাৎ ১৭ই মার্চ ১৯৭১ তারিখে বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানের সেনা শাসক জেনারেল ইয়াহিয়া খানের সাথে দ্বিতীয় দফায় এক বৈঠকে মিলিত হন। বৈঠক থেকে বের হলে বঙ্গবন্ধুকে কিছুটা গম্ভীর দেখাচ্ছিল। সাংবাদিকদের সাথে কথা বলার সময় বঙ্গবন্ধুর মুখে মৃদু হাসির ছটা দেখে একজন বিদেশি সাংবাদিক বলেন, "ইয়াহিয়া খানের সাথে আলোচনার গতিধারা সম্পর্কে এই হাসিটুকু তাৎপর্যবহ কি-না?" বঙ্গবন্ধু মৃদু হেসেই জবাব দিলেন, "আমি সর্ব অবস্থাতেই হাসতে পারি। এমনকি 'জাহান্নামের আগুনে বসিয়া হাসি পুষ্পের হাসি।" তারপর সাংবাদিককে বঙ্গবন্ধু বললেন, "আপনিও তো হাসছেন।" কঠিন পরিস্থিতিতেও বঙ্গবন্ধু ধীরস্থির থেকে নিজ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে সর্বদাই সাহস নিয়ে এগিয়ে গেছেন। রবীন্দ্র পঙক্তি 'শান্ত তোমার ছন্দ' বঙ্গবন্ধুর দিগন্ত প্রসারী দৃষ্টিভঙ্গিরই যথাযথ প্রতিচ্ছবি।

জনৈক বিদেশি সাংবাদিক একাত্তরে বঙ্গবন্ধুর ৫২তম জন্মদিনে প্রশ্ন করেছিলেন, "জন্মদিনের উৎসবের কোন অনুষ্ঠান আজ আপনার হয় নি? মোমবাতি জ্বালিয়ে জন্মদিনের কেক সাজানো হয় নি? আপনি একেক করে সেই মোমবাতি ফুঁদিয়ে নিভিয়ে ফেলার পর শুভেচ্ছা জানিয়ে কেউ গান গেয়ে ওঠে নি?" বঙ্গবন্ধু জবাবে বলেছিলেন, "জন্মদিনের উৎসব! আমি জন্মদিনে উৎসব পালন করি না। এই দুখিনি বাংলায় আমার জন্মদিনই-বা কি আর মৃত্যুদিনই-বা কি? আপনারা বাংলাদেশের অবস্থা জানেন। এ দেশের জনগণের কাছে জন্মের আজ নেই কোন মহিমা। যখনই কারও ইচ্ছা হলো, আমাদের প্রাণদিতে হয়। আমার আবার জন্মদিন কি? আমার জীবন নিবেদিত আমার জনগণের জন্য। আমি যে তাদেরই লোক।" (অধুনালুপ্ত দৈনিক পাকিস্তান, ১৮ মার্চ, ১৯৭১) জনগণের মঙ্গল ও মানুষের প্রতি সহমর্মিতায় জীবনভর-তৎপর ছিলেন বঙ্গবন্ধু। মানুষের প্রতি ভালোবাসাই ছিল বঙ্গবন্ধুর জীবন দর্শনের মূল উপজীব্য।

বৃটিশ সাংবাদিক ডেভিড ফ্রস্টের প্রশ্নের উত্তরে বঙ্গবন্ধু বলেন যে তাঁর জীবনের সবচেয়ে বড়ো যোগ্যতা হচ্ছে তিনি মানুষকে ভালোবাসেন আর সবচেয়ে দুর্বল দিক হচ্ছে তিনি মানুষকে বেশি ভালোবাসেন। বঙ্গবন্ধু জীবনের স্বমূল্যায়ন করতে গিয়ে ভালোবাসার বাইরে যেতে পারেননি। এই ছিলেন আমাদের জাতির জনক বঙ্গবন্ধু।

"আমি জনগণের এবং জনগণ আমার। আমি বাংলার মাটিকে ভালবাসি। আমায় ভালবাসে বাংলার মাটি। বাংলা আমার। আমি বাংলার।" - এই আত্মোপলব্ধিই বঙ্গবন্ধুকে মাটির মানুষের কোমল হৃদয়ের এত কাছাকাছি এনে দিয়েছে। সাড়ে সাতকোটি মানুষ তাই প্রাণের নিবিড়তম স্পর্শে এই মুক্ত মহাপ্রাণকে অনুভব করে আপনজন হিসেবে। জাতি আজ অনাড়ম্বর পরিবেশে হৃদয়ের উষ্ণ উত্তাপে জাতির জনকের পঞ্চান্নতম জন্মদিন উদ্‌যাপন করবে। (অধুনালুপ্ত দৈনিক বাংলা, ১৭ মার্চ ১৯৭৪)

বঙ্গবন্ধুর জীবনে শেষ জন্মদিন ছিল ১৭ই মার্চ, ১৯৭৫। অধুনালুপ্ত দৈনিক বাংলা সেদিন এক নিবন্ধে লিখেছিল ১৯৫৪ সালের ঘটনা। বাংলাদেশ তখন জাগতে শুরু করেছিল গ্রামে, গঞ্জে, শহরে। সেসময় পল্টনে বঙ্গবন্ধুর বক্তৃতা শুনতে আসা একজন সাধারণ শ্রোতার উক্তি, "আমরা শেখ মুজিবের কথা বুঝি। কারণ, তিনি আমাদের ভাষায় কথা বলেন। আমরা তাঁর কথা শুনতে আসি। কারণ, এমন সহজে এত জোর দিয়ে আমাদের দুঃখের কথা আর কেউ বলতে পারেন না। আমরা তাঁকে ভালোবাসি। তিনিও ভালবাসেন আমাদের। সুখে-দুঃখে আমরা তাঁর সাথে আছি। এবং থাকবো। কারণ তিনি আমাদের আপন মানুষ।"

মানবতাবোধ ও মানবিকতার শীর্ষ ধাপ হচ্ছে মানুষের প্রতি অন্তহীন ভালোবাসা। বঙ্গবন্ধু রচিত 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী', 'কারাগারের রোজনামচা' ও 'আমার দেখা নয়াচীন' গ্রন্থত্রয়ের পাতায় পাতায় বঙ্গবন্ধুর মানবতাবোধের দৃষ্টান্ত দীপ্যমান হয়ে আছে।

মার্কিন চলচ্চিত্র নির্মাতা লিয়ার লেভিন-এর ভাষায়, "বঙ্গবন্ধুর নাম, ক্যারিশমা ও নেতৃত্ব ছিল প্রচণ্ড বিশ্বাসযোগ্য এক শক্তি। সেই শক্তিই একটি জাতিকে জাগিয়ে তুলেছিল। নিয়ে গিয়েছিল বহুকাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতার পথে। সম্ভব হয়েছিল নতুন একটি দেশের মহাজন্ম উদ্‌যাপন করার।" (বঙ্গবন্ধু থেকে বিশ্ববন্ধু, এন আর বি সি ব্যাংক প্লানেট প্রকাশনী, পৃঃ ৬৯৫)।

একাত্তরের পঁচিশে মার্চ ভয়াবহ রাতে যখন পাকিস্তানের বর্বর বাহিনী ঘুমন্ত ও নিরস্ত্র বাঙালির উপর গণহত্যা শুরু করে তখন ছাব্বিশে মার্চ প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধু নির্ভয়ে ও নিঃশঙ্কচিত্তে বাংলাদেশের আনুষ্ঠানিক ও আইনগত স্বাধীনতা (de jure declaration of independence) ঘোষণা দেন। অসাধারণ দূরদৃষ্টি ও গভীর প্রজ্ঞার কারণে বঙ্গবন্ধু জীবনে সর্বদাই সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এবং নিয়মতান্ত্রিকভাবে এগিয়ে গেছেন।

পঁচাত্তরের পনেরই আগস্টেও ঘাতকদের গুলির সামনে বঙ্গবন্ধু মাথা উঁচু করে এসে দাঁড়ান ও আভিজাত্যের সাথে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করেন। বাঙালির মুক্তিদাতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব যে মরণজয়ী তা ঘাতকদের জানার কথা নয়। বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ও দর্শন জাতিকে সর্বদাই পথ নির্দেশনা দিবে। মুজিব মৃত্যুঞ্জয়ী ও চিরঞ্জীবী।

বঙ্গবন্ধুর জাদুকরী ও সম্মোহনী নেতৃত্বের ফলেই যে আমরা আজ স্বাধীন দেশের গর্বিত নাগরিক তার ইতিহাস পাকিস্তানের ঔপনিবেশিক আমলের চব্বিশ বৎসরের নির্যাতন ও বঞ্চনার ইতিহাস। পর্যায়ক্রমে বাঙালি জাতিকে কীভাবে স্বাধীনতার মূলমন্ত্রে দিক্ষীত করলেন বঙ্গবন্ধু তা আজ সারা পৃথিবীর কাছে এক বিশাল বিস্ময়। কিন্তু আমরা জানি এর পেছনে বঙ্গবন্ধুর জীবনের প্রতিটি সেকেন্ড কীভাবে কাজে লাগিয়েছেন। বলতে গেলে পাকিস্তানের চব্বিশ বছরই বঙ্গবন্ধু কারাগারেই ছিলেন। কারণ যখন কারাগারের বাইরে ছিলেন তখনও পাকিস্তানি গোয়েন্দাদের তীক্ষ্ণ নজরদারিতে থাকতেন প্রতিটি মুহূর্ত। বঙ্গবন্ধু একবার নিজেই বলেছিলেন যে, "কারাগার আমার দ্বিতীয় বাসস্থান।" কি

নিদারুণ সংকটের মাঝে বঙ্গবন্ধু নেতৃত্ব দিয়ে বাঙালি জাতিকে পাহাড়ের ন্যায় অটল ঐক্যবদ্ধ করেছিলেন তা মানব মুক্তির আন্দোলনের দীপ্তিময় দৃষ্টান্ত।

শ্রীলংকার দু'বারের পররাষ্ট্রমন্ত্রী লক্ষণ কাদির গামার (১৯৩২-২০০৫) মতে, "দক্ষিণ এশিয়া গত কয়েক শতকে বিশ্বকে অনেক শিক্ষক, দার্শনিক, রাষ্ট্রনায়ক, রাজনৈতিক নেতা ও যোদ্ধা উপহার দিয়েছে। কিন্তু শেখ মুজিবুর রহমান সবকিছুকে ছাপিয়ে যান। তাঁর স্থান নির্ধারিত হয়ে আছে সর্বকালের সর্বোচ্চ আসনে। শেখ মুজিবুর রহমান রাজবংশের সন্তান নন, তিনি পাশ্চাত্যের বিলাসী উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করেননি। তিনি ছিলেন এক নিভৃত পল্লীর মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্ম নেওয়া সাধারণ মানুষ।" (বঙ্গবন্ধুর জীবনই বাঙালি জাতির রাষ্ট্রবিজ্ঞান, আজিজুল ইসলাম ভূঁইয়া, পৃঃ ২৪৪)

১৯৭০ সালের ৭ ডিসেম্বর দীর্ঘ প্রতিক্ষীত পাকিস্তানের সাধারণ নির্বাচনে অভূতপূর্ব বিজয়ের পর ১০ ডিসেম্বর ১৯৭০ লন্ডনের দ্য টাইমস পত্রিকা আওয়ামী লীগ প্রধান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে পূর্ব পাকিস্তানের 'মুকুটহীন সম্রাট' হিসেবে আখ্যায়িত করে। গার্ডিয়ান পত্রিকা এক সম্পাদকীয় নিবন্ধে শেখ মুজিবকে নিরঙ্কুশ বিজয়ী ও পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে আখ্যা দেয়।

বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা ১৯৭৪ সালের ৯ই জানুয়ারি লন্ডনের নিউ স্টেটসম্যান সাময়িকী উদ্ধৃত করে নিম্নোক্ত সংবাদ পরিবেশন করে যা পর দিন অর্থাৎ ১০ জানুয়ারি ১৯৭৪ তারিখের অধুনালুপ্ত দৈনিক বাংলা পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। খবরে বলা হয় যে "সম্প্রতি লন্ডনের নিউ স্টেটসম্যান-এর এক নিবন্ধে বঙ্গবন্ধুকে বাংলাদেশের 'শ্রেষ্ঠ সম্পদ' বলে বর্ণনা করা হয়েছে। নিবন্ধে বলা হয় যে, অতীতের চেয়ে-আজকের বাংলাদেশে মুজিবের নেতৃত্বের প্রয়োজন অনেক বেশি।" বঙ্গবন্ধুর প্রথম পাঁচসালা পরিকল্পনার ইতিবাচক দিক তুলে ধরে বাংলাদেশের দীর্ঘমেয়াদি সমৃদ্ধির আশা প্রকাশ করা হয় উক্ত নিবন্ধে।

গত ১৪ মার্চ, ২০২২ তারিখে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এম আইটি প্রেস থেকে 'ইনোভেসন' সাময়িকীতে প্রকাশিত তাঁর প্রবন্ধের সূত্র ধরে বলেন যে, "জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন ছিল যে এ দেশের মানুষ উন্নত সমৃদ্ধ জীবন পাবে, সুখে শান্তিতে বাস করবে। কিন্তু আরাধ্য কাজ শেষ করার আগেই তিনি ঘাতকদের হাতে সপরিবারে নিহত হন। তাঁর সেই অসমাপ্ত কাজ শেষ করাই আমার লক্ষ্য।" সাময়িকীতে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা রচিত 'Striving to Realise the Ideals of My Father' শীর্ষক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে।

১৪১১ বঙ্গাব্দের প্রথমদিন অর্থাৎ ১লা বৈশাখ (২০০৪ সালের ১৪ এপ্রিল) ব্রিটিশ ব্রডকাস্টিং করপোরেশন বা বিবিসির বাংলা সার্ভিস সকালের অধিবেশনে বিশ্বের প্রায় ত্রিশ কোটি বাঙালির মাঝে পরিচালিত শ্রোতা জরিপের চূড়ান্ত ফলাফল প্রকাশ করে।জরিপ অনুযায়ী 'সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি' হিসেবে বঙ্গবন্ধুর নাম ঘোষণা করে। শীর্ষ কুড়িজন বাঙালির তালিকা প্রণয়নে বিবিসি এ জরিপ পরিচালনা করে।

জরিপের ফলাফল ঘোষণার এ অধিবেশনে প্রয়াত সাংবাদিক আতাউস সামাদ বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে বলেন, "উনি নির্বাচনি যে প্রচারগুলো করেছেন তার অনেকগুলো জায়গায় আমি তাঁর সংগে গিয়েছি। উনি সবখানেই ছয়-দফার কথা বলতেন এবং ছয় দফা না হলে একটি আঙুল তুলে বলতেন আমার দাবি 'এই' অর্থাৎ দেশ স্বাধীন করতে হবে।" জনাব সামাদ আরও বলেন, "১৯৭১ সালের ৭ মার্চ রমনার রেসকোর্সে তিনি এমন একটি বক্তৃতা দিলেন যা সবার মনছুঁয়ে-গেল, সবাই ওনার নির্দেশ মানতে লাগল এবং ওনার নামেই স্বাধীনতাযুদ্ধ চলেছে। নয় মাসের যুদ্ধের পর-পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি দেশে ফিরেছিলেন শেখ মুজিবুর রহমান।"

স্বাধীনতার পর বঙ্গবন্ধুর প্রথম জন্মদিনে ভারতের তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী রাষ্ট্রীয় সফরে বাংলাদেশে আসেন ও সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে বঙ্গবন্ধুর সাথে একই মঞ্চ থেকে বিশাল জনসভায় ভাষণ দেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্রসংসদের প্রথম আজীবন সদস্য করা হয় বঙ্গবন্ধুকে ১৭ই মার্চ ১৯৭২ তারিখে। ঐ দিন ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর সফর উপলক্ষ্যে বঙ্গবন্ধুর কর্ম ব্যস্ততার কারণে আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন হয় ১৯৭২ সালের ৬ই মে তারিখে। সেদিন বঙ্গবন্ধু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় খেলার মাঠে শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে ভাষণ দেন ও ডাকসুর আজীবন সদস্যপদ গ্রহণ করেন।

বঙ্গবন্ধু ১৭ই মার্চ ১৯৭২ তারিখে ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর সফর উপলক্ষ্যে সাধারণ ছুটি ঘোষণা করেন। তবে বঙ্গবন্ধু এক বিবৃতিতে বলেন, ভবিষ্যতে ১৭ই মার্চ তাঁর জন্মদিন হিসেবে সরকারি ছুটি থাকবে না এবং দিনটি হবে ত্যাগ ও উৎসর্গের দিন।

এ দেশের সাড়ে সাত কোটি দুঃখী মানুষের কল্যাণে বঙ্গবন্ধুর জীবন উৎসর্গীকৃত। এ উৎসর্গই হচ্ছে তাঁর সকল শক্তির উৎস। আর এ জন্যই এ দেশের সাধারণ মানুষের জীবন ও ভাগ্যের উপর তাঁর অপরিসীম প্রভাব। (দৈনিক ইত্তেফাক, ১৭ মার্চ ১৯৭৩)

জাতীয় শিশু দিবসে আমাদের দায়িত্ব হচ্ছে বঙ্গবন্ধু শিশুদের যেভাবে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন সেভাবে যেন আমরা শিশুদের পরিচর্যা করি। ১৯৫২ সালে গণচীন সফরে গিয়ে বঙ্গবন্ধু সে দেশের শিশু-কিশোরদের শিক্ষাব্যবস্থা গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করেন যার বর্ণনা আমরা পাই 'আমার দেখা নয়াচীন' গ্রন্থে। বৈষম্যহীন, একমুখী, বাধ্যতামুলক ও অবৈতনিক যে প্রাথমিক শিক্ষার প্রচলন বঙ্গবন্ধু করেছিলেন তার সাথে এবারের শিশু দিবসের প্রতিপাদ্যের মিল রয়েছে। প্রজাতন্ত্রের সকল শিশুর সমঅধিকার নিশ্চিত করার প্রতিজ্ঞায় আসুন, আজ আমরা ঐক্যবদ্ধ প্রয়াসের সূচনা করি। বঙ্গবন্ধু বিশ্বাস করতেন আজকের শিশুরাই বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ রচনা করবে। তাই তিনি শিশুদের সুস্থ শারীরিক, মানসিক, সাংস্কৃতিক বিকাশ দেখতে চেয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধুর আজীবনের স্বপ্ন ছিল সোনার বাংলায় থাকবে সোনার মানুষ। রবীন্দ্র নাথের পঙক্তি 'তুমি নব নব রূপে এসো প্রাণে' উচ্চারণ আজকের দিনে জাতির প্রত্যাশা। ❑

লেখক : শিক্ষাবিদ ও সাবেক ভিসি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।